লালন ফকির (১৭৭৪ - ১৮৯০) বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশক। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রীতিনীতিতে তিনি মানব ধর্মের পূজারি ছিলেন। তিনি মরমি-সাধক। মানুষকে মানুষ হিসেবেই তিনি জাত-পাত, সম্প্রদায় বিদ্বেষ, প্রথা সংস্কার-কে গুরুত্ব দেননি।

লালন তাঁর বেশ কয়েকটি গানে জাত-পাতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন; যার ক্ষেত্রে মূলীভূত কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে তার ব্যক্তি-জীবনের তিক্ত-অভিজ্ঞতা। কথিত আছে লালন হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। তীর্থ যাত্রা থেকে ফেরার সময়ে বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হলে তার সঙ্গী-সাথি-রা ফেলে পালায়, ফলে হিন্দু ধর্ম থেকে চ্যুত হয় লালন। পরবর্তী ধর্ম প্রচারে নানা বাধার ও সৃষ্টি করা হয়। এই সব বৈষম্য মূলক আচরণ লালনকে উদ্বুদ্ধ করে জাত-পাতের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করতে —

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জেতের কি রূপ,
দেখলাম না এ নজরে ॥ ......
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়?
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে?"

— লালনের কবিত্ব শক্তি বিস্ময়কর। ভাবের সঙ্গে ভাষার যথার্থ মিলনে তার গান অসামান্য শিল্প সমৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, খাঁটি বাউলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোনো ছোঁয়া নেই, কেননা জাত-পাত দুস্তর দূরত্ব বাড়িয়ে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করে। 'জাতের নামে বজ্জাতি'-র বিরুদ্ধে নজরুলের অনেক আগে লালনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এই গান। এই প্রসঙ্গে লালন আলোচ্য গানে বলেন —

"যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কীসে রে?"

— অর্থাৎ সমাজে পুরুষের জাত চেনার উপায় আছে, কিন্তু নারীর জাত সম্পর্কে কোনো চিহ্ন সমাজ নির্মাণ করেনি, মালা, তসবি — যা ধর্মীয় রীতিনিয়মের চিহ্ন রূপে থাকে, চিহ্ন সমাজে মান্যতা পেয়েছে। কিন্তু ধর্ম, বর্ণ, গোত্র তথা জাতি নির্বিশেষে মানুষের বাহ্যতাকে কোনো চিহ্ন থাকে না, তাই লালন বললেন —

"যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কার রে;"

লালনের গানে মানব মহিমা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লালন আত্ম সাধনা করেছেন, যেখানে তিনি কোনোরকম অন্ধকারে অন্তর্ভুক্ত হননি, তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন, মানুষ ছাড়া মানুষের কোনো মুক্তি নেই। এই মানুষই একমাত্র পরিত্রাতা, তাই সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষেরা লালনের ধর্মকে মন থেকে গ্রহণ করেছেন। আসলে লালন কখনও ভেদ-বৈষম্যকে গ্রহণ করেননি, তিনি যেই মানুষের সন্ধান করেছেন, সে মানুষ অধরা, ফলে লালনের প্রাপ্তি এখানে যে, যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি মানুষের মধ্যেই অরূপ-রতন সন্ধান করেছেন। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি লালনের ধর্মকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

লালনের মতো একই ধারণায় অন্যান্য বাউলেরাও তাঁরা মনে করেন জলের যেমন ভেদ হয় না, তেমনি মানুষেরও ভেদ নেই। কিন্তু মানুষ শুধু নিজস্ব স্বার্থ, বুদ্ধির কারণে জাতিভেদ তৈরি করেছে। আর অসাধু ধর্ম ধ্বজাধারীরা জাত গোত্রের নামে চিরকাল ধ্বংস করে এসেছে মানবতাকে, এরা নিজেদের স্বার্থে জগতজুড়ে 'জেতের' কথার জোর প্রচার করে এসেছে। জনপদাবলির পদকর্তারা জাতের এই ধ্বজ-ধারীদের বিদায় দিতে চায়। জাত নয়, কর্ম গুণেই সমাজের গোত্র চিহ্নিত হোক। ঈশ্বর কখনোই জাতিভেদের বিধান

দিতে পারেন না। তার জন্য কোরান থেকে যাতে ক্রমে প্রত্যেকটি মানুষ স্ব চেতনায় ভজনা করুক।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" — পদটির কবি কে? পদটি কোন পর্যায়ের অন্তর্গত? পদটির কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।

→ ■ উদ্ধৃত পদটি কোনো কোনো গ্রন্থে আদি-চৈতন্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের নামে পাওয়া গেলেও চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাসের নামেই অধিক পরিচিত।

■ আলোচ্য পদটি আক্ষেপানুরাগের পদ। আক্ষেপানুরাগ নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে পৃথক কোনো রসপর্যায় নেই, এটি আসলে প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ের একটি দিক। অনুরাগের চতুর্বিধ রূপের কথা আছে, যার একটি আক্ষেপানুরাগ —

"অনুরাগের লক্ষণ সব চারি প্রকার
উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ, অভিসার,"

[নন্দকিশোর দাস — রসকলিকা]

অনুরাগের আধিক্যে ব্যাকুল বা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অনুপস্থিত প্রিয়জন, স্বজন বা নিজেকে নিয়ে আক্ষেপ করাকে বলে আক্ষেপানুরাগ। রূপ গোস্বামী আট প্রকার আক্ষেপের কথা বলেছেন, কৃষ্ণের প্রতি, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, মুরলীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, গুরুজনের প্রতি এবং নিজের প্রতি। রাধা কৃষ্ণের জন্য করেননি এমন কিছু নেই। ঘর-বার, পর-আপন, দিন-রাত একাকার করে ফেলেছিলেন কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পেলেন না। এই না পাওয়া জনিত যে আক্ষেপ তাই আক্ষেপানুরাগ। আলোচ্য পদটিতে রাধার প্রাণের আকুতি জনিত আক্ষেপ অত্যন্ত সহজ, সরল অথচ বেদনাময় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

■ রাধা চেয়েছিলেন সুখ, সেজন্য ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শরীর শীতল করার জন্য চন্দ্রালোক চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পেলেন সূর্যের প্রখর কিরণ। উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন অগাধ জলে। চেয়েছিলেন লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য কিন্তু দারিদ্র্য তাকে বেষ্টন করে ধরল। নিতান্ত অবহেলায় বহুমূল্য মানিক হারিয়ে ফেললেন। যা ফিরে পাবার আশায় নগর ছাড়লেন, সাগর বাঁধলেন কিন্তু তা শুধু তার কর্মদোষে সাগর শুকিয়ে গেল, মানিক আবার হারিয়ে গেল। তৃষ্ণা মেটাবার জন্য মেঘের কাছে গেলেন — জল চাহিতে পরিবর্তে পেলেন বজ্র।

■ পদটির ছত্রে ছত্রে আছে রাধার বেদনা জর্জর আক্ষেপের প্রকাশ। যা চেয়েছিলেন তা তিনি পাননি। গোটা পদে আছে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল, যা বিষম অন্ধকার। রাধার আক্ষেপের পিছনে আছে কৃষ্ণ অনুরাগ। তিনি কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর সর্বস্ব দিয়ে, চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে নিয়ে সুখে ঘর করতে, কৃষ্ণপ্রেম রূপ অমৃত সাগরে স্নান করতে কিন্তু সেই সুখের ঘর আগুনে পুড়ে গেল। অমৃতের সাগর পরিণত হল গরলের সাগরে — সে জন্যই তার আক্ষেপ। যে আক্ষেপে ফুটে উঠে তার প্রেমের অতৃপ্ত জনিত নৈরাশ্য ও দীর্ঘশ্বাস, মিলনের স্নিগ্ধতা নয়, বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলে পোড়ায় যেন রাধার ভাগ্য লিপি।

■ কৃষ্ণপ্রেমে ঐকান্তিক রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ স্ত্রীজাতি রাধার আক্ষেপময় পদটির ছত্রে ছত্রে অনুরণিত। কৃষ্ণের উপেক্ষার বেদনা তার অন্তরকে শেলবিদ্ধ করেছেন। তিনি কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন। কুলধর্ম, নারীধর্ম, জগৎসংসার সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পেলেন কই। জ্ঞানদাসের রাধার এ বেদনায় নবভাবে রবীন্দ্ররাধার কণ্ঠে ধ্বনিত —

> "যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী, আমারে ভুলিবে কেন সে
> ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন — এই ছিল তার মানসে,"

— অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায় রাধার যে বেদনা তা আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় — আমরা ভুলে যাই অতি নিছক বৈষ্ণবতত্ত্ব, রাধা বাস্তবের কোনো নায়িকা নয়।

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" — কবিতাটি কোন কাব্য পর্যায়ের অন্তর্গত? পর্যায়টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে পদটির কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।

→ ◪ মাথুর বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর রসে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্গত. মাথুর পর্যায়ের অপর নাম প্রবাস. রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে মাথুর তথা প্রবাসের সংজ্ঞায় বলেন —

"পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥"

— অর্থাৎ পূর্বে মিলন প্রাপ্ত নায়ক নায়িকার মধ্যে দেশ, গ্রাম, নদী, অরণ্য, পর্বত ইত্যাদি স্থানান্তরের ব্যবধান ঘটলে প্রাজ্ঞজন তাকে বলেন প্রবাস। সুদূর প্রবাস মাথুর। আলোচ্য পদটি মৈথিলি কোকিল বিদ্যাপতির লেখা মাথুর পর্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট পদ।

◪ কংস বধের কারণে কৃষ্ণ গিয়েছেন মথুরায়। যাবার পূর্বে রাধাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন ফিরে আসবে কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। এদিকে প্রাকৃতিক নিয়মে এসেছে বর্ষার ভাদ্র মাস, শ্রীমতি রাধা কৃষ্ণ বিরহে বর্ষার এই দিনগুলি কেমন করে কাটছে সে কথায় সখিকে সম্বোধন করে জানাচ্ছেন —

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া,"
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

■ রাধা বলছেন তাঁর দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই, তিনি একাকী গৃহে, পরিপূর্ণ বর্ষার ভাদ্র মাস, বর্ষা নিবিড় হয়ে উঠেছে, চারি-দিকে তার ব্যাপ্তি। মেঘ গর্জনে সারা ভুবন ভরে তোলে, বৃষ্টি হচ্ছে অবিরত। মিলনের মধু লগ্নে কান্ত (প্রেমিক) আজ বহু দূরগত। নিষ্ঠুর পঞ্চশরের বিয়োগিনী রাধিকে আরও জর্জরিত করে তুলেছে, বজ্রপাতের আনন্দে ময়ূরের মত্ত নৃত্য, দাদুরী মত্ত হয়ে উঠেছে, ডাহুকী ডেকে চলেছে, অর্থাৎ প্রেমের অনুকূল পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া রাধার হৃদয় তোলপাড় করছে। বিদ্যাপতির এ সৌন্দর্য সৃষ্টি অনুপম। নিবিড় বর্ষার আতিশয্যকে রাধার বেদনাকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের যে একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে তা এখানে সুচিত্রিত।

■ আলোচ্য পদের বেদনা রূপায়ণ অমনি সার্থক যে মনোজ্ঞ এক অনির্বারণ উন্মাদনা সঞ্চার করে। এক বিশেষ মুহূর্ত ও পরিবেশে মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য সুরে ছন্দে ভাবে ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে পদে। অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু পদটির এক চমৎকার নান্দনিক রসব্যাখ্যা দিয়েছেন —

> “ইহার মধ্যে প্রাণ নিংড়ানো যন্ত্রণা নাই, তৎপরিবর্তে একপ্রকার রসাবেশ আছে, ... মানব হৃদয়ের একটি বেদনাকে চরম আত্মসমর্পণ দান করিবার জন্য যে মত্ত বর্ষা দিনের প্রয়োজন কবি তাকেই চয়ন করেছেন; এ বর্ষা ‘অবিরল ঝর ঝর জলধর’ নয়; নায়িকার চোখে বর্ষধারা নামে নাই — তাহার হৃদয়ে বর্ষামঙ্গল হইতেছে।”

[মধ্যযুগের কবি ও কাব্য]

■ বিদ্যাপতির আলোচ্য কবিতায় যে মানবিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য। যে কোনো দৃষ্টিতে এটি একটি বিশিষ্ট আধুনিক গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি ধর্মমতে যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন না, তাই বৈষ্ণব ধর্মের কোনো অনুশাসন তাঁকে মেনে চলতে হয়নি। এখানে রাধা চরিত্রে আমরা যেন মর্ত্য নায়িকাকে

প্রত্যক্ষ করি। ব্রজবুলির ধ্বনিঝঙ্কারে, প্রথমকলাবৃত্ত ছন্দে এবং অলংকরণের উৎকর্ষের আলোচ্য পদটি বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।